□ ১। 'ধ্বনি' (Sound)

মানুষের ইচ্ছায়, তার গলা থেকে নিঃসৃত স্বর, বায়ুস্তরে শোনার মতো যে স্পন্দন তোলে, তাকে বলে ধ্বনি।

যেমন—অ, আ, ই, উ, এ, ঐ, ক, গ, শ—এদের উচ্চারণটুকুই 'ধ্বনি'। কথা বলা বা গান করার সময় আমাদের গলা থেকে স্বর বের হয়। তা বেরিয়ে বায়ুতে আঘাত করে। তাতে যা উৎপন্ন হয়, তা—ই 'ধ্বনি'। 'ধ্বনি' আমরা কানে শুনি, চোখে দেখি না। অবশ্যই ভাষা ও ছন্দ-বিজ্ঞানে পশু পাখির ডাক বা পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট ধ্বনিকে 'ধ্বনি' বলে না। সেখানে একমাত্র মানুষের কণ্ঠ জাত ধ্বনিই 'ধ্বনি'। সুতরাং 'ধ্বনি' হল মানুষের কণ্ঠ জাত, মানুষের ইচ্ছায় সৃষ্ট, মানুষের শ্রুতিগ্রাহ্য। তার রূপ নেই, তবে প্রতীক দিলে তার নাম হবে 'বর্ণ'।

□ 'ধ্বনি' দু-প্রকার—'স্বরধ্বনি' ও 'ব্যঞ্জনধ্বনি'।

(ক) যে-ধ্বনি মানুষের গলা থেকে স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন—অ আ ই ঈ প্রভৃতি।

(খ) যে-ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন—ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি।

□ ২। ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

ভাষা নদীর স্রোতের মতো। নদীর মতোই সে প্রবহমান। নিজেকে সর্বদাই সে সজীব রেখে চলেছে। নদীর মতোই সে গতিপথ বদলে দেয়। এই রূপ-বদলের মূলে আছে তার 'ধ্বনি'গুলির পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন প্রথম দেখা যায় মানুষের মুখের ভাষায়।

যেমন—'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে গদাধরচন্দ্র বলছে ঃ

'ডুডুও খাবো, টামাকও খাবো'।

ধ্বনিপরিবর্তনের এ এক চমৎকার উদাহরণ। আসল ধ্বনি ছিল—দুধও খাবো, তামাকও খাবো। এখানে 'দু' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'ডু' হয়েছে, 'ধ' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'ডু' হয়েছে, 'তা' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'টা' হয়েছে। এই হল ধ্বনি পরিবর্তন।

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ অনেক। কিন্তু এই কারণগুলি সব ভাষার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের যে-কারণগুলি আছে, ইংরেজি বা ফরাসী ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের পেছনে সে কারণগুলি প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে স্বীকার্য যে, ধ্বনিপরিবর্তনের পেছনে সর্বাধিক দায়ী ধ্বনি উচ্চারণ-কারী মানুষ।

ধ্বনি পরিবর্তনের বহুজনমান্য প্রধান কারণ হল ঃ

১. বক্তার বাগযন্ত্রের ত্রুটি ঃ

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যেই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। কিন্তু সেই বাগ্‌যন্ত্রের কোনো ত্রুটি থাকলে, ধ্বনি যথাযথভাবে উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন—বক্তার জিহ্বার জড়তা থাকলে উচ্চারণের বিকৃতি ঘটে। 'আমাকে দুটো ভাত দাও' বাক্যটি তোত্‌লার মুখে উচ্চারিত

Scanned with CamScanner

হয়—'আমগে ডুটো বাট ডাও' এবং খনার মুখে উচ্চারিত হয়—'আমাকেঁ ডুঁটো বাঁট ডাঁও'। এখানে তোত্‌লামির জন্যে লোকটি 'দ' কে 'ড', 'ভ' কে 'ব' উচ্চারণ করছে। এতে ধ্বনি পাল্টে যাচ্ছে—ধ্বনি পরিবর্তিত হচ্ছে।

২. শ্রোতার শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি ঃ

শ্রোতার কানের ত্রুটি থাকলে, অর্থাৎ শ্রোতা কালা হলে, বক্তার কথা সে অবিকৃতভাবে শুনতে পায় না। প্রবাদ আছে, একজন কালা চাকরকে মুনিব জল আনতে বলার সঙ্গে সঙ্গে সে তেল এনে হাজির করেছে।—এই হল কালার বিড়ম্বনা। এই যে এক বলতে আর শোনা, এভাবেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। কানের ত্রুটি থাকলে, শব্দ বা ধ্বনি যথাযথ শোনা যায় না। ফলে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়।

৩. শ্রোতার অনুকরণের ত্রুটি ঃ

একজনের উচ্চারিত ভাষা শুনেই আমরা ভাষা বলতে শিখি। এটাই অনুকরণ। কিন্তু বক্তার কথা অসাবধানতা, অজ্ঞতা, অলসতার জন্যে বা বুঝতে না-পারা প্রভৃতি কারণে অনেক সময় শ্রোতার অনুকরণে মূল ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন—মূল শব্দ 'সার্‌টি ফিকেট'। কিন্তু গ্রামের একজন সাধারণ শ্রমিক উচ্চারণ করে 'সারট্যপিট'। কোনো কোনো ব্যক্তি 'ব্যবহার' শব্দটিকে উচ্চারণ করে 'ববহার'। 'কোদাল' কে 'কুদাল', 'খুন্তি' কে 'খুরপী', 'অশত্থ' (অশথ) গাছকে 'আশুদ' গাছ। এ হল অনুকরণের ত্রুটির উদাহরণ। এরই ফলে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে।

৪. দ্রুত উচ্চারণ ঘটিত ত্রুটি ঃ

খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় শব্দের কোনো কোনো অংশ উচ্চারিত হয় না—তখন ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—'কোথা থেকে এলি?' দ্রুত উচ্চারণে 'কোত্থেকে এলি?' 'গভর্নমেণ্ট' দ্রুত উচ্চারণে—'গম্‌মেণ্ট', 'মাস্টার মশাই' থেকে 'মাস্টামশাই' ইত্যাদি। এখানে মাঝের ধ্বনির স্খলন ঘটছে। এমনি উচ্চারণ পরবর্তীকালে মূল ধ্বনিকে পাল্টে দেয়—ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে।

৫. সহজ উচ্চারণ প্রবণতা ঃ

অনেক সময় সংযুক্ত-ব্যঞ্জনের জটিলতাকে পরিহার করার জন্য আমরা সংযুক্ত-ব্যঞ্জনকে ভেঙ্গে দিই। কখনো নতুন ধ্বনির আগম ঘটাই, কখনো সমীকৃত করি। আর তাতেই ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—জন্ম ও কর্ম শব্দের ব্যবহার দেখি—'একথা জম্মেও শুনিনি'। 'ওখানে কি কম্মো করো?' এই যে জন্ম থেকে জম্মো, কর্ম থেকে কম্মো এবং মধু থেকে মউ, বধূ থেকে বউ, যোগ্য থেকে যুগ্গি, পোষ্য থেকে পুষ্যিতে পরিবর্তন—এই হল সহজ উচ্চারণ প্রবণতা জনিত ধ্বনির পরিবর্তন।

৬. আবেগময়তা ঃ

অনেক সময় স্নেহ-প্রীতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা বশত আমরা কোনো কোনো শব্দকে অতিরিক্ত ধ্বনি দিয়ে উচ্চারণ করি, যাতে শব্দটির মধ্যে আমাদের ভালোলাগা-বোধটি জড়িয়ে যায়। আর তাতেই মূল ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—মামা থেকে মামু, কাকা থেকে কাকু, বিনোদ থেকে বিনু, জ্যেঠা থেকে জেঠু, বাবা থেকে বাপু (বয়স্কদের মুখে)।

৭. শ্বাসাঘাত জনিত পরিবর্তন ঃ

অনেক সময় কোনো কোনো শব্দ আমরা যথাযথ উচ্চারণ না-করে তার কোনো কোনো অংশে জোর দিয়ে ফেলি, আর তাতেই মূল ধ্বনিটি পাল্টে যায়। এতে শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত্যস্বর লোপ পেতে পারে বা 'স্বতোদ্বিত্বভবন' ঘটতে পারে। যেমন—শব্দটি ছিল

Scanned with CamScanner

'গামোছা'। কিন্তু আদি স্বরে জোর বা শ্বাসাঘাত পড়ার ফলে শব্দটি পাল্টে হল 'গামছা'। তেমনি 'সকল' থেকে সক্কল', ছোট থেকে ছোট্ট, ইত্যাদি।

৮. লোকনিরুক্তি জনিত পরিবর্তন ঃ

কোনো কোনো অপরিচিত বা বিদেশি শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে, আমরা পরিচিত শব্দের সদৃশ করে তাকে উচ্চারণ করে ফেলি, তারই ফলে যে পরিবর্তন ঘটে, তাকেই 'লোক-নিরুক্তি'গত পরিবর্তন বলে। যেমন—ইংরেজি 'আর্মচেয়ার' শব্দটি, আরামের সাদৃশে আরামচেয়ার উচ্চারিত হয়। তেমনি 'হসপিটল' শব্দটি ধ্বনি সাদৃশ্যের জন্য হাঁসপাতাল হয়েছে। মূল কথা ছিল 'টাকার কুবের' (ধনদেবতা যক্ষ)। কুমীরের সাদৃশ্যে 'কুবের' শব্দটি পাল্টে গিয়ে উচ্চারিত হল 'টাকার কুমীর'।

৯. ছন্দের লালিত্য সৃষ্টি জনিত পরিবর্তন ঃ

অনেক সময় কবি সাহিত্যিক, এমনকি সাধারণ মানুষ আমরাও শব্দকে সুন্দর করে বলতে চেষ্টা করি। সেজন্যে ছন্দের মিল বা ধ্বনির সুষম উচ্চারণে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই শব্দের ধ্বনির পরিবর্তন ঘটাতে হয়। যেমন 'বীণা' শব্দটি কবির হাতে 'বীণে' বা 'বীণ' হয়েছে, প্রমাণ—'বাজিয়ে রবি তোমার বীণে / আনল মালা জগত জিনে।'—অতুল প্রসাদ। 'বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ'—রবীন্দ্রনাথ। 'ভিতর' শব্দটি মধুসূদনের হাতে হয়েছে 'ভিতরি'—'নিকুঞ্জ বিহারী পাখি পিঞ্জর ভিতরি'। 'পাখি' শব্দটি ধ্বনির সৌন্দর্য আনতে হয়েছে 'পাখ'। যথা—'পাখ পাখালির' (ঝড় ঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। 'চূড়া' শব্দটি হয়েছে 'চূড়'। 'চন্দ্রচূড় জটাজালে'—মধুসূদন।

১০. ভিন্ন ভাষার সান্নিধ্য ও প্রভাব জনিত পরিবর্তন ঃ

প্রত্যেক ভাষারই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। উচ্চারণ ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য আছে। ধর্মীয়, ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক কারণে এক ভাষার মানুষ অন্য ভাষার কাছে আসে। দীর্ঘদিন আসার পরে একভাষার উচ্চারণগত নিজস্বতা অন্য ভাষায় সঞ্চারিত হয়। আর তাতেই ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—মূল শব্দ ছিল 'বন্ধ'। হিন্দির উচ্চারণ 'বন্‌ধ্'। আমরাও এখন ধর্মঘটকে (যাতে দোকানপাট বাস ট্রেন বন্ধ থাকে) হিন্দির প্রভাবে 'বন্‌ধ্' বলি। হিন্দি ভাষীদের সঙ্গে একত্র থাকার এই ফল। এই যে বন্ধ > বন্‌ধ্—এই হল ধ্বনি পরিবর্তন।

১১. ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও পরিবেশগত পরিবর্তন ঃ

ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—'ভৌগোলিক অবস্থানের উপর দেশের আবহাওয়া নির্ভর করে, এবং আবহাওয়ার উপর দেশের অধিবাসীদের দেহচর্চা ও শরীরপ্রক্রিয়া (উচ্চারণে মুখপ্রযত্ন ইত্যাদি) নির্ভর করে। সুতরাং একই ধ্বনির উচ্চারণে স্থান বিশেষে ঈষৎ বৈলক্ষণ্য দেখা দিতে পারে।'[১]

যেমন—পুরুলিয়াতে যাকে বলে 'পেথ্যা', বর্ধমানে তারই উচ্চারণ 'পেথে'। আবার পশ্চিম বাংলায় যার উচ্চারণ গাড়ি—বাড়ি, পূব বাংলায় তারই উচ্চারণ 'গারি', 'বারি'। তেমনি 'মাছ' > মাস্, ছিল > সিলো প্রভৃতি। তবে ডঃ সেন বলেছেন এই বৈলক্ষণ্য বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত অদ্যাপি হয়নি।

১২. ব্যক্তিগত প্রভাব জনিত পরিবর্তন ঃ

ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণ রীতিতে অনেক সময় ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। ক্রমে ক্রমে সেই পরিবর্তনটুকু তার পরিবারের সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। সেই ব্যক্তি প্রতিভাবান ও

Scanned with CamScanner

প্রভাবশালী হলে, তার সেই উচ্চারণ-রীতি পরিবার থেকে সমাজে, এমনকি দেশের অন্য স্থানে সঞ্চারিত হয়। যেমন—একদা রবীন্দ্রনাথ অনেক শব্দকে নিজের মনের মতো উচ্চারণ করতেন। আর সেই সূত্রে শান্তিনিকেতনের তাবৎ ভক্তমণ্ডলীর উচ্চারণে রবীন্দ্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ করি—ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের অনেক শব্দের উচ্চারণ তাঁর শিষ্য সুকুমার সেনের উচ্চারণে শোনা যেতো। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—'ভাষার বিশেষত্বের জট খুলিলে শেষ পর্যন্ত গিয়া পাইব ব্যক্তি অথবা পরিবার বিশেষের বাক্‌ব্যবহারে। কিন্তু এ অভিমতের সপ্রমাণ উপাদান চিহ্নবিহীন অতীতের গর্ভে বিলীন।'[১]

❑ ৩। ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ও চারটি সূত্র

যে কোনো ভাষার পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, সেখানে বহু বিচিত্র ভাবেই ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে। কিভাবে, কোন্ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটছে, ভাষা-বিজ্ঞানীরা সে-নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁরা চারটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। সেগুলি হল :

এক॥ ধ্বনি লোপ।
দুই॥ ধ্বনি আগম।
তিন॥ ধ্বনি রূপান্তর।
চার॥ ধ্বনি স্থানান্তর।

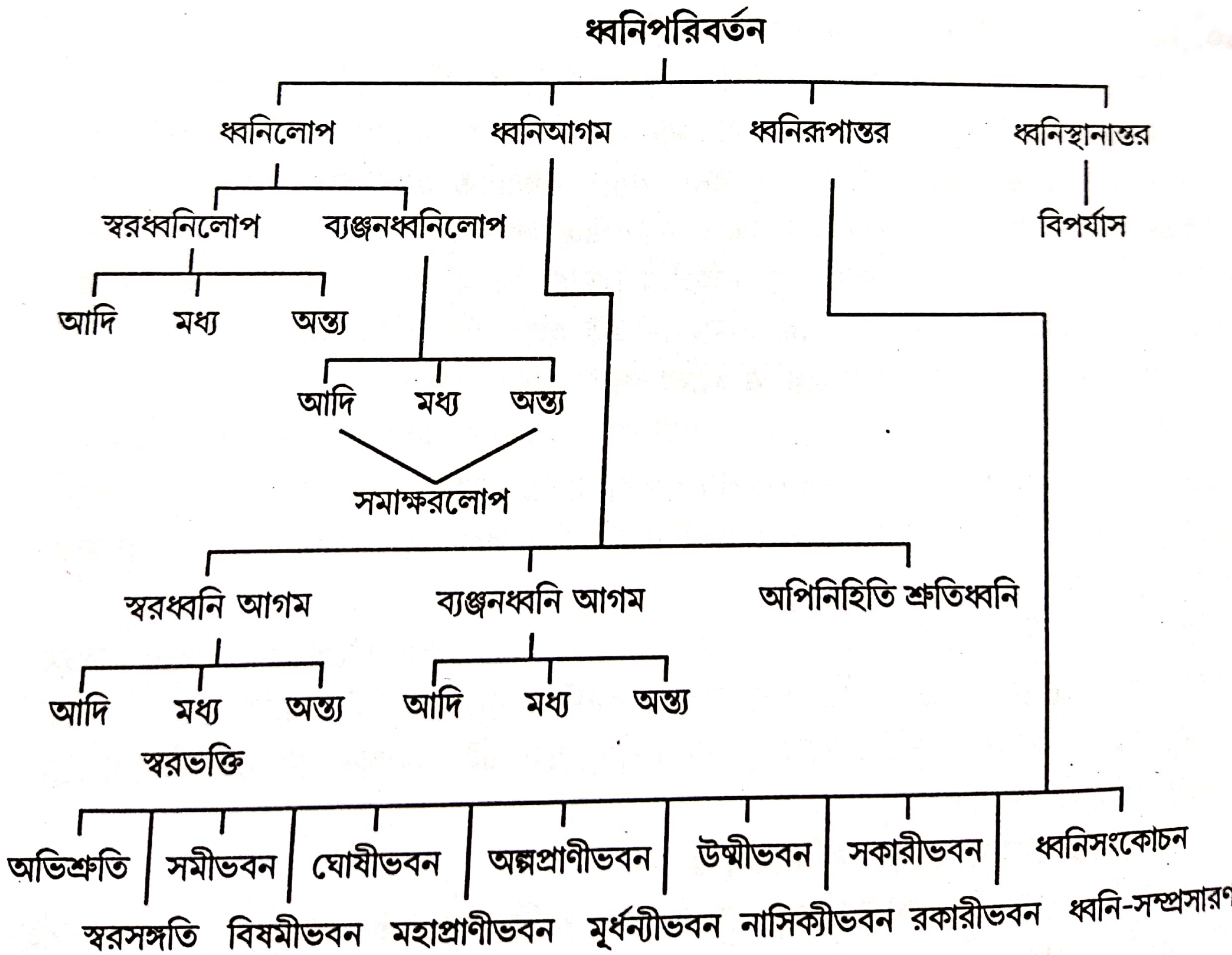

Scanned with CamScanner

এক॥ 'ধ্বনি লোপ'

শব্দ উচ্চারণের সময় 'শ্বাসাঘাত', 'দ্রুততা', 'অসাবধানতা' ও 'অনুকরণ ত্রুটি'-র জন্যে শব্দের কোনো কোনো ধ্বনি স্থলিত হয়ে পড়ে, ক্রমশঃ তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। একেই বলে 'ধ্বনিলোপ'। ধ্বনিলোপ দুই প্রকার—(অ) স্বরধ্বনিলোপ, (আ) ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ। ধ্বনিলোপের আর একটি সূত্র সমধ্বনিলোপ বা সমাক্ষরলোপ।

(অ) স্বরধ্বনি-লোপ ঃ স্বরধ্বনিলোপ তিন প্রকার—আদিস্বর-লোপ, মধ্যস্বর-লোপ ও অন্ত্যস্বর-লোপ।

১. **আদিস্বর-লোপ ঃ** কোনো কোনো সময় আদি ছাড়া অন্যস্বরে শ্বাসাঘাত পড়লে, আদি স্বরটি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে এক সময় লোপ হয়ে যায়। একে বলে আদিস্বর-লোপ। যেমন ঃ ওঝা > ঝা। উদ্ধার > ধার। আছিল > ছিল। অলাবু > লাউ।

২. **মধ্যস্বর-লোপ ঃ** কখনো কখনো শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়লে, শব্দের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি দুর্বল হয়ে ক্রমশ লোপ পায়। একেই বলে মধ্যস্বর-লোপ। যেমন ঃ গামোছা > গাম্‌ছা। কলিকাতা > কলকাতা। নাতিজামাই > নাত্‌জামাই। ভগিনী > ভগ্নী।

৩. **অন্ত্যস্বর-লোপ ঃ** কখনো কখনো শব্দের আদি অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়লে, অন্ত্যস্বর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে লোপ পায়। তাকেই অন্ত্যস্বর লোপ বলে। যেমন ঃ ভিন্ন > ভিন। রাশি > রাশ। নিত্য > নিত্‌। অগ্র > আগ।

(আ) ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ ঃ ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের উদাহরণ দুর্লভ। যদিও বা মধ্যব্যঞ্জন লোপের উদাহরণ দু-চারটি মেলে, আদি ও অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন পাওয়া দুষ্কর। তবুও পণ্ডিতেরা কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন—

১. আদিব্যঞ্জন লোপ—শ্মশান > মশান, স্থিতু > থিতু, স্থান > থান।

২. মধ্যব্যঞ্জন লোপ—পাটকাঠি > পাকাঠি, শৃগাল > শিআল। ফলাহার > ফলার।

৩. অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ—সখী > সই। নাহি > নাই। গাত্র > গা। বড়দাদা > বড়দা। বউদিদি > বউদি।

(ই) সমাক্ষরলোপ ঃ পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমঅক্ষর বা সমধ্বনির একটি লোপ পেলে সমাক্ষর লোপ পায়। যেমন—

বড়দাদা > বড়দা। ছোট কাকা > ছোটকা।
মুখখানি > মুখানি। লৌকিকতা > লৌকিতা। পটললতা > পলতা।

দুই॥ 'ধ্বনি-আগম'

উচ্চারণে সরলতা বা সৌন্দর্য আনার জন্য অনেক সময় শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তে স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনির আগম ঘটে, তাকেই বলে 'ধ্বনি-আগম'। ধ্বনি আগম দুই প্রকার। (অ) স্বরধ্বনির আগম; (আ) ব্যঞ্জনধ্বনির আগম।

(অ) স্বরধ্বনি আগম ঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্যে শব্দের কোনোস্থানে স্বরের আগমনকে স্বরধ্বনি-আগম বলে। স্বরধ্বনি আগম তিন প্রকার ঃ ১. আদি স্বরাগম ২. মধ্য স্বরাগম বা স্বরভক্তি এবং ৩. অন্ত্যস্বরাগম।

১. **আদি স্বরাগম ঃ** শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে, কখনো কখনো তার উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য তার আগে একটা স্বরধ্বনি এসে যায়। তাকেই আদিস্বরাগম বলে। যেমন ঃ স্পর্ধা > আস্পর্ধা। স্কুল > ইস্কুল। স্ক্রু > ইস্কুপ। স্ত্রী > ইস্ত্রিরি।

Scanned with CamScanner

স্টেশন > ইস্টিশন। স্পিরিট > ইস্পিরিট।

২. **মধ্য স্বরাগম বা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ** ঃ উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য কখনো কখনো, শব্দের মধ্যবর্তী যুক্তব্যঞ্জন ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে, মধ্যস্বরাগম হয়। একেই স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে।

যেমন ঃ ভক্তি > ভকতি। মুক্তা > মুকুতা। কর্ম > করম। ফ্লিম > ফিলিম। শ্লোক > শোলোক। প্রীতি > পিরীতি।

৩. **অন্ত্যস্বরাগম** ঃ উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য শব্দের অন্তে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে তাকে অন্তস্বরাগম বলে।

যেমন ঃ পিণ্ড > পিণ্ডি। দুষ্ট > দুষ্টু। বেঞ্চ > বেঞ্চি। নস্য > নস্যি। সত্য > সত্যি। কড়া > কড়াই।

(আ) ব্যঞ্জনধ্বনি আগম ঃ উচ্চারণ সুবিধার জন্য শব্দের কোনো কোনো স্থানে ব্যঞ্জনধ্বনি আগম হলে তাকে ব্যঞ্জনাগম বা ব্যঞ্জনধ্বনি আগম বলে। তবে স্বরধ্বনি আগমের মতো ব্যঞ্জনধ্বনির আগম বেশি মেলে না—কিন্তু বিরল নয়। শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনাগম প্রচুর। যেমন—

১. আদি ব্যঞ্জনাগম—ওজা > রোজা। উই > রুই। উপকথা > রূপকথা। ওমলেট > মামলেট।

২. মধ্যব্যঞ্জনাগম—অম্ল > অম্বল। বানর > বাঁদর। পোড়ামুখী > পোড়ারমুখী।

৩. অন্ত্যব্যঞ্জনাগম—নানা > নানান। বহু > বহুল। জমি > জমিন। সীমা > সীমানা। বাবু > বাবুন। খোকা > খোকন।

(ই) অপিনিহিতি (Epenthesis) ঃ শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে, সেই 'ই' বা 'উ' যথা—নির্দিষ্ট স্থানের আগেই উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন ঃ

১. 'ই' কারের অপিনিহিতি ঃ রাতি > রাইত। আজি > আইজ। করিয়া > কইর্যা। গাঁটি > গাঁইট। পাখি > পাইখ। চারি > চাইর।

২. 'উ' কারের অপিনিহিতি ঃ সাধু > সাউধ। মাথুয়া > মাউথুয়া। মাছুয়া > মাউছুয়া। নাটুয়া > নাউটুয়া। মাঠুয়া > মাউঠুয়া। ভাতুয়া > ভাউতুয়া।

অপিনিহিতি নামটি দেন ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার। উক্ত সংজ্ঞাটিও তাঁরই দেওয়া। পশ্চিমবাংলার 'রাঢ়ী' উচ্চারণে এখন অপিনিহিতি মেলে না। এখন বাংলাদেশের লোকেদের মৌখিক উচ্চারণে অপিনিহিতি প্রচুর। তবে রাঢ়েও যে একদা অপিনিহিতি ছিল, তার প্রমাণ মেলে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে ঃ "কার সনে দ্বন্দ্ব 'কইর্যা' চক্ষু কৈলা রাতা।" কিংবা লোচন দাসের গানে ঃ "আঁখির জলে বুক ভিজিল 'ভাইস্যা' গেল পাটা।"

৩. সুকুমার সেন বলেন, যুগ্ম-ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে 'ই'কার আগম হলে অপিনিহিতি হয়। যেমন ঃ বাক্য > বাইক্ক্য। লক্ষ > লইক্‌খ। যক্ষ > যইক্‌খ, যজ্ঞ > যইগ্‌গোঁ ইত্যাদি।

(ঈ) 'শ্রুতিধ্বনি' (Glide) ঃ পাশাপাশি দুটি ধ্বনির উচ্চারণ কালে, অসাবধানতাহেতু কিংবা উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্যে, ওই দুটি ধ্বনির মাঝখানে তৃতীয় একটি ধ্বনি এসে গেলে, তাকে শ্রুতিধ্বনি বলে। যেমন—

শৃগাল > শিআল > শিয়াল। এখানে প্রথমে 'গ'-এর লোপ, পরে 'য়' এর আগম। তেমনি বানর > বান্দর (প্রা-বাং, এখানে 'দ'-এর আগম) > বাঁদর (আ. বাং—চন্দ্রবিন্দুর (ঁ) আগম।

শ্রুতিধ্বনি প্রধানত দু রকম—'য়' শ্রুতি ও 'ব' শ্রুতি। এছাড়া 'দ', 'ল' প্রভৃতি শ্রুতিও আছে।

Scanned with CamScanner

(১) য়-শ্রুতি ঃ দুই ধ্বনির মাঝে 'য়'-এর আগম ঘটলে 'য়' শ্রুতি। যেমন—সাগর > সাঅর > সায়র। লোহা > নোয়া। এখানে ল > ন উচ্চারিত হয়েছে। 'হ' লোপ পেয়ে, অ এসেছে। সেই 'অ' > 'য়' হয়েছে।

(২) ব-শ্রুতি ঃ দুই ধ্বনির মাঝে 'ব'-এর আগম ঘটলে 'ব' শ্রুতি হয়। তবে বাংলায় অন্তঃস্থ 'ব' নেই বলে লেখা হয়—উঅ, ওঅ, ওয়। যেমন, যা + আ = যাওয়া (এখানে যথার্থ বানান হওয়া উচিত ছিল 'যাবা'। তেমনি—শূকর > শূঅর > শূওর, শূয়োর। এছাড়া ঃ

(৩) 'হ' আগম হলে হ শ্রুতি।—বেয়ারা > বেহারা, রাজকুল > রাউল > রাহুল।

(৪) 'দ' আগম হলে 'দ' শ্রুতি।—বানর > বাঁদর, জেনারেল > জাঁদরেল।

(৫) 'র' আগম হলে 'র' শ্রুতি।—পুষ্ট > পুরুষ্ট।

তিন॥ ধ্বনি-রূপান্তর

শব্দের মধ্যে যদি কোনো স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি স্থান পরিবর্তন করে, বা একটি অপরের সঙ্গে স্থান বিনিময় করে, তখন তাকে ধ্বনিরূপান্তর বলে। ধ্বনি রূপান্তর বহু রকম।

ধ্বনিরূপান্তর

অভিশ্রুতি | স্বরসঙ্গতি | সমীভবন | বিষমীভবন | বিপর্যয় | ঘোষীভবন | অঘোষীভবন | মহাপ্রাণীভবন......

(১) অভিশ্রুতি (Umlaut) ঃ

অপিনিহিতির পরের স্তর হল অভিশ্রুতি। অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ' ধ্বনি যদি লোপ পায় কিংবা অন্য স্বরের প্রভাবে নব রূপ পায়, অথবা অপর স্বরের সঙ্গে মিশে নতুন রূপ পায়—তবে তাকে 'অভিশ্রুতি' বলে।

যেমন—করিয়া > কইর‍্যা > করে। এখানে অভিশ্রুতির 'কইর‍্যা'র 'অ' এবং 'ই' পাশাপাশি থাকায় পরস্পরকে প্রভাবিত করছে ও সন্ধিবদ্ধ হয়ে 'এ'-কারে নবরূপ পাচ্ছে। তেমনি ঃ

মূলশব্দ > অপিনিহিতি > অভিশ্রুতি।

কালি	কাইল	কাল	বাণিয়া >	বাইন্যা >	বেনে
রাতি	রাইত	রাত	চলিয়া >	চইল্যা >	চলে
বাদিয়া	বাইদ্যা	বেদে	আসিয়া >	আইস্যা >	এসে

(২) 'স্বরসঙ্গতি' ঃ

যদি শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটি পৃথক স্বরধ্বনি থাকে এবং তাদের একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে বা দুটিই দুটিকে প্রভাবিত কোরে একই রকম (প্রায় একই রকম) স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে 'স্বরসঙ্গতি' বলে।

যেমন—বিলাতি > বিলিতি—এখানে 'আ' ও 'ই' পাশাপাশি থাকায়, 'ই' 'আ'কে প্রভাবিত করেছে। এবং 'আ', সঙ্গতি লাভ করে 'ই' তে রূপান্তরিত হয়েছে।—এই হল স্বরসঙ্গতি।

স্বরসঙ্গতি চার রকমের—'প্রগত', 'পরাগত', 'মধ্যগত' ও 'অন্যোন্য'।

(ক) প্রগত— পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি। মিথ্যা > মিথ্যে, হিসাব > হিসেব, তিনটা > তিনটে।

Scanned with CamScanner

(খ) পরাগত— পরবর্তী স্বরের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গতি। সন্ন্যাসী > সন্নিসি, দেশি > দিশি, পিছন > পেছন।

(গ) মধ্যগত— পূর্ব বা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে মধ্য স্বরের সঙ্গতি। নিড়ানি > নিড়ুনি, বিলাতি > বিলিতি, বারান্দা > বারেন্দা।

(ঘ) অন্যোন্য— পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরের পারস্পরিক প্রভাবে পারস্পরিক পরিবর্তন। যেমন— শেফালি > শিউলি। শোনা > শুনা। বাদলিয়া > বাদুলে। নাটকিয়া > নাটুকে।

(৩) 'সমীভবন' (Assimilation) ঃ

'সমীভবন' হল ব্যঞ্জনসংগতি। যদি শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটি পৃথক ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে, এবং তাদের একটি অপরটিকে প্রভাবিত কোরে, বা দুটিই দুটিকে প্রভাবিত কোরে একই রকম (বা প্রায় একই রকম) ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে 'ব্যঞ্জনসঙ্গতি বা সমীভবন' বলে।

সমীভবন তিন রকমের—'প্রগত', 'পরাগত', 'অন্যোন্য'।

(ক) প্রগত— পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গতি— পদ্ম > পদ্দ। ব্যঞ্জন > ব্যন্নন। পক্ব > পক্ক। চক্র > চক্ক।

(খ) পরাগত— পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গতি। পোতদার > পোদ্দার। গল্প > গপ্প। কর্পূর > কপ্পূর।

(গ) অন্যোন্য— পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ব্যঞ্জনের পারস্পরিক প্রভাবে পারস্পরিক পরিবর্তন। যেমন—বৎসর > বচ্ছর। মৎস্য > মচ্ছ, মহোৎসব > মোচ্ছব। মেঘ করেছে > মেক্করেছে।

(৪) বিষমীভবন (Dissinilation) ঃ

সমীভবনের উল্টো প্রক্রিয়ার নাম 'বিষমীভবন'। যদি শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে বিষম বা পৃথক ধ্বনিতে রূপ পায়, তবে তাকে বিষমীভবন বলে।

যেমন—লাল > নাল। বিষমীভবনের উদাহরণ নেই বললেই চলে। তবে ডঃ সুকুমার সেন উদাহরণ দিয়েছেন 'পোর্তুগীস শব্দ 'আর্মারিও' (Armario) থেকে বাংলা 'আলমারী'। সংস্কৃত 'মর্ত্য' > উড়িয়া ভাষায় বিষমীভবন—'মঞ্চ'। 'ললাট' > 'নলাড'।

(৫) ঘোষীভবন (Voicing) ঃ

অঘোষধ্বনি যদি সঘোষ হয়, তাহলে ঘোষীভবন হয়। যেমন—উপকার > উবগার, কাক > কাগ, কতদূর > কদ্দুর, ছোটদা > ছোড়দা।

(৬) অঘোষীভবন (Deroicing) ঃ

সঘোষধ্বনি যদি অঘোষ হয়, তাহলে অঘোষীভবন হয়। যেমন—অবসর > অপসর, ছাদ > ছাত, পাপড়ি > পাবড়ি, বড়ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর (ভাসুর)।

Scanned with CamScanner

(৭) মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) ঃ

বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ বা ধ্বনি এবং 'হ' বর্ণ হল মহাপ্রাণবর্ণ। মহাপ্রাণবর্ণের প্রভাবে অল্পপ্রাণবর্ণ যদি মহাপ্রাণবর্ণের মতো উচ্চারিত হয়, তবে তাকে মহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন—পাশ > ফাঁস। বিবাহ > বিভা। স্তম্ভ > থাম।

(৭) (ক) স্বতোমহাপ্রাণীভবন (Spontaneous Aspiration) ঃ

মহাপ্রাণধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি কোনো অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণিত হয়, তখন তাকে স্বতোমহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন—পুস্তক > পুঁথি (এখানে ত > থ, কোনো মহাপ্রাণধ্বনির প্রভাব নেই)। তেমনি—জীর্ণ > ঝুণা, ক্রীড় > খেলা, কিঞ্চিৎ > কিছু।

(৮) অল্পপ্রাণীভবন (De-aspiration) ঃ

মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণধ্বনিতে পরিণত হলে, অল্পপ্রাণীভবন হয়। যেমন— করছি > কচ্ছি, দুধ > দুদ। শৃঙ্খল > শিকল। হস্ত > হত্থ > হাত। মহার্ঘ > মাগ্‌গি।

(৯) মূর্ধন্যীভবন (Cerebralisation) ঃ

ঋ, র, ষ-এর প্রভাবে দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হলে মূর্ধন্যীভবন হয়। যেমন—মৃত্তিকা > মাটি, ক্ষুদ্র > খুড়া, বৃদ্ধ > বুড়া, চতুর্থ > চৌঠা।

(৯) (ক) স্বতোমূর্ধন্যীভবন ঃ

কারো প্রভাব ছাড়াই দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে রূপ পেলে স্বতোমূর্ধন্যীভবন হয়। যেমন—বালতি > বালটি। পতঙ্গ > ফড়িং। পততি > পড়ই > পড়ে।

(১০) উষ্মীভবন (Spirantisation) ঃ

ধ্বনিউচ্চারণ কালে (ক) শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাধা পেলে স্পর্শধ্বনি (= ক-ম) হয়, (খ) আংশিকবাধা পেলে উষ্মধ্বনি (= শ ষ স হ) হয়। কিন্তু। (গ) স্পর্শধ্বনি উচ্চারণে যদি পূর্ণ বাধা না-পায়—আংশিক বাধা পায়, তবে সেই স্পর্শধ্বনি উষ্মধ্বনিতে রূপ পায়। একেই বলে উষ্মীভবন। প্রধানত চট্টগ্রামী উপভাষায় উষ্মীভবন লক্ষ্য করা যায়। (রাঢ়ী উচ্চারণে নেই)। যেমন—কালীপূজা > খা. লী. ফু. জা (Xalifuza), ফুল (Phul) > ফুল (fool), বাদাম > বা. দা. ম.।

(১১) নাসিক্যীভবন (Nazalisation) ঃ

নাসিক্যধ্বনি (= ঙ ঞ ণ ন ম) যদি নিজে লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে অনুনাসিক করে তোলে, তাহলে তাকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন—হংস > হাঁস, দন্ত > দাঁত, সন্ধ্যা > সাঁজ।

(১১) (ক) স্বতোনাসিক্যীভবন ঃ

নাসিক্যধ্বনির লোপ বা প্রভাব ছাড়াই যদি অকারণে কোনো ধ্বনি অনুনাসিক হয়ে ওঠে, তবে তাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। যেমন—পুস্তক > পুঁথি। ইষ্টক > ইঁট। পেচক > পেঁচা, যূথী > জুঁই, সূচ > ছুঁচ। হাসপাতাল > হাঁসপাতাল।

Scanned with CamScanner

(১২) সকারীভবন (Assibilation) ঃ

উষ্মীভবনের জন্য যদি পৃষ্ঠ বা ঘৃষ্টধ্বনি স (s) শ (ʃ) জ (z)-তে পরিণত হয়, তবে তাকে সকারীভবন বলে। প্রধানত পূর্ববঙ্গের একটি উপভাষাতেই সকারী ভবনের ছড়াছড়ি। যেমন—খেয়েছে > খাইসে, গাছ > গাস, আছে > আসে।

(১৩) রকারীভবন (Photacism) ঃ

'স' (s) যদি প্রথমে 'জ' (z) এবং পরে 'র' (r)-তে পরিণত হয়, তাকে রকারীভবন বলে। যেমন—দ্বাদশ > দুবাজস > বারস > বারহ > বার; পঞ্চদশ > পন্নডহ > পনর।

(১৪) ধ্বনি-সংকোচন (Contraction) ঃ

দ্রুত উচ্চারণে কোনো কোনো সময় শব্দের সবকটি ধ্বনিই আমরা উচ্চারণ করি না—কিছু ধ্বনি মিলে তার সংক্ষিপ্ত রূপ উচ্চারণ করি। একে বলে ধ্বনি সংকোচন। যেমন—যাহা ইচ্ছা তাই = যাচ্ছেতাই, বাঁকুড়া > বাঁক্‌ড়ো, পরিষদ > পর্ষদ। লবঙ্গ > লং (বাঁকুড়া)। ইতি-হ আস > ইতিহাস।

(১৫) ধ্বনি-প্রসারণ (ধ্বনি-বিস্ফোরণ) (Expansion) ঃ

দীর্ঘ বা ধীর উচ্চারণে কোনো কোনো সময় আমরা শব্দের নির্দিষ্ট সংখ্যক ধ্বনিকে বাড়িয়ে উচ্চারণ করি, তাকে প্রসারণ বলে। যেমন—পর্তুগীজ্ পেরা > বাংলা পেয়ারা; স্নান > সিনান॥

চার॥ ধ্বনি-স্থানান্তর

শব্দের মধ্যে একটি ধ্বনি অন্য ধ্বনির স্থানে গেলে, বা ধ্বনিগুলি পরস্পর স্থান বদল করলে, 'ধ্বনি-স্থানান্তর' হয়। প্রধানত বিপর্যাসের (= বিপর্যয়) মাধ্যমেই স্থানান্তর ঘটে।

বিপর্যাস (Metathesis) ঃ একটি শব্দের মধ্যে যদি দুটি ধ্বনি পরস্পর স্থান বিনিময় করে তাহলে বিপর্যাস ঘটে। যেমন—মুকুট > মুটুক; রিক্‌সা > রিস্‌কা; হ্রদ > দহ > হদ। জানালা > জালানা, বাক্‌স > বাস্‌ক, জীবাণু > বীজাণু।

এছাড়া 'জোড়কলম শব্দনির্মাণ', 'মিশ্রণ' প্রভৃতি আরো বহুবিধ কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—জোড়কলম শব্দ নির্মাণে—হাঁস + জারু > 'হাঁসজারু'। নিশ্চল + চুপ > নিশ্চুপ॥

Scanned with CamScanner

Bengali (Gen)
SEC [4th Sem]

- তথ্যসূত্রঃ— <u>ভাষাতত্ত্ব</u>
বাংলা ভাষার ইতিহাস

- লেখক — - অধ্যাপক
মিহির চৌধুরী - কামিল্যা